প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

বিচারের বাণী

মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

গত ১৩ মে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ কয়েকবার পড়েছি। ভাষণে দেওয়া নির্বাচন এ বছরের শেষেই হওয়ার আশ্বাস কিংবা ঘরোয়া রাজনীতির নিয়মাবলি স্বাভাবিকভাবেই আমাকে এবং বোধ করি আমার মতো ভোটার জনগণকে আকৃষ্ট করেনি, বরং ঘরপোড়া গরুরা যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে চমকে ওঠে, তেমনি চেনা পেশাদার রাজনীতিকদের বাংলাদেশের সচিবালয়ে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনায় চমকে উঠেছি। তবে তার চেয়েও অধিক চমকে উঠেছি ভাষণে একটি বিশেষ কার্যক্রমের উল্লেখ করায়। যার সারসংক্ষেপ-প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য নির্বাচনের মাধ্যমে টেকসই গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মতে, এ জন্য প্রয়োজন 'একটি অভিন্ন জাতীয় ঐকমত্য', যাকে 'একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে' এবং "এই প্রেক্ষিতে সরকার, রাজনৈতিক দল, সকল শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ' তৈরি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনি এখন অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ পড়ে দ্বিতীয়বার অধিক চমকে উঠেছি কেন? তাঁর ভাষণের উদ্ধৃত লাইনগুলো পড়লে এই ধারণা হয় যে আসল বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির যেন জন্মই হয়নি এবং তাই প্রয়োজন ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ'। তবে এটা সঠিক কথা যে মুক্তিযোদ্ধা জনগণের প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা, যা বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে আছে, রাষ্ট্রটির জন্মের গোড়া থেকে আজতক যে দলেরই হন না কেন সাংসদেরা ক্ষমতায় ছিলেন, সেগুলো অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু সেগুলো তো আছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে দাঁড়িয়ে কারও কি সাহস আছে বলার, আকাশে কোনো নক্ষত্র নেই কিংবা হিমালয় পর্বতের সামনে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো চোখের সামনে ধরে হিমালয় নেই বললেই কি সেই পর্বতমালা নেই হয়ে যাবে?

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম হচ্ছে, 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'। এই ভাগে ৮ থেকে ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদগুলো আছে। তবে সামরিক শাসনকালে ১২ অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং কয়েকটির সংশোধন করা হয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক, আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুরোপুরি অবজ্ঞাসূচক। যেমন-১২ অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে ১৯৭৮ সালের সামরিক আইন দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন জারি করে। ১২ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি এই, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন-বিলোপ করা হইবে।' বাংলাদেশের মানুষ একটি লোকায়ত জাতি, আর কিছুই নয় এই আকাঙ্ক্ষাটি তৈরি হয়েছিল সুখে-দুঃখে একমাত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জেদ থেকে। যার ফলেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অমোঘ। ৯ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদগুলোর মূল বা আদি পাঠ যদি পড়া হয় তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির ভবিষ্য চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা জনগণের আকাঙ্ক্ষায় কী ছিল তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। অনুচ্ছেদগুলোর সংক্ষিপ্তসার এই: প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত থাকবে [অনুচ্ছেদ ১১, ১২] শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে মালিকানা-ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও আইনের নির্দিষ্ট ব্যক্তিমালিকানা। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, যার উদ্দেশ্য সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করা [অনুচ্ছেদ ১০, ১৩, ১৪, ১৬, ২০(২)] জাতির ঐক্যের ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও স্মৃতিনিদর্শন রক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে [অনুচ্ছেদ ৯, ২৩, ২৪] সবার জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত থাকবে এবং যোগ্যতানুসারে ও কর্মানুযায়ী নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে পারিশ্রমিক লাভ করবেন এবং কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে পারবেন না। অনুচ্ছেদ ১৯, ২০(১) মৌলিক প্রয়োজনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা। গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা বন্ধ করা [অনুচ্ছেদ ১৫, ১৭, ১৮] সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য হবে সব সময় জনগণের সেবা করা

[অনুচ্ছেদ ২১] রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথক্‌করণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে [অনুচ্ছেদ ২২] রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

এমনই একটি সত্য ও ন্যায়ের দেশের–সঠিক বলতে সোনার বাংলার–বাসিন্দা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা জনগণ এবং তারই রূপরেখা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, যেগুলো সংবিধানে না লেখার সাহস সংবাদপ্রণেতাদের তৎকালে আদৌ ছিল না। যদিও আজতক ক্ষমতা পাওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সবাই জনগণের উপরিউক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেছে। তবু একসময় সে রকম তাদের দেশটি হবে–এই আশায় সব দেশেরই হতভাগ্য ব্যক্তিরা বেঁচে থাকে এবং সে আশা না থাকলে তার পরিণতি কী হয় ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর লেখা 'দি লোয়ার ডেপথ' (নিচুতলার মানুষ) নাটকে তার মমস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন:

'লুকা: একটা লোককে আমি চিনতাম যে একটি সত্য ও ন্যায়ের দেশে বিশ্বাস করত।

'বুবনভ: কিসে?

'লুকা: সত্য-ও-ন্যায়ের দেশে। ও বলত, 'এই দুনিয়ায় একটি সত্য-ও-ন্যায়ের দেশ নিশ্চয়ই রয়েছে।' আর সেই দেশটায়, ওর মতে, রয়েছে এক বিশেষ ধরনের মানুষ, ভালো মানুষ, এমন সব মানুষ যারা পরস্পরকে সম্মান করে আর ছোটখাটো ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে। ওর মতে 'ওই দেশে সবকিছুই আশ্চর্যজনক সুন্দর।' আর তাই সে সত্য-ও-ন্যায়ের দেশ খুঁজে দেখতে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবত। লোকটা ছিল খুবই গরিব। ওর জীবনটা ছিল খুব কঠিন। কখনো কখনো অবস্থা এত খারাপ হয়ে যেত যে মনে হতো শুধু পড়ে মরে যাওয়া ছাড়া ওর ভাগ্যে আর কিছুই নেই। কিন্তু ও হাল ছাড়েনি। সে সব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলত, 'ঠিক আছে। আমি এসব সহ্য করতে পারি। আমি আর অল্প কিছুটা অপেক্ষা করব এবং তারপর এই জীবন ছেড়ে দিয়ে সত্য-ও-ন্যায়ের দেশে চলে যাব। এই সত্য-ও-ন্যায়ের দেশের ব্যাপারটা ছিল তার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

'পেপেল: ও কি কখনো সেখানে যেতে পেরেছিল?

'লুকা: তারপর সাইবেরিয়ায় যে গ্রামে থাকত, সেখানে একজন শিক্ষিত মানুষ নির্বাসন খাটতে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বই, মানচিত্র–এসব; একজন শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে যা থাকে। এই গরিব লোকটা ওই শিক্ষিত মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, 'দয়া করে আমাকে বলবেন এই সত্য-ও-ন্যায়ের দেশটি কোথায়? আর কেমন করেই বা সেখানে পৌঁছানো যায়।' তখন-তখনই ওই শিক্ষিত মানুষটি তাঁর বইপত্র বের করে মানচিত্রে খুঁজলেন আর খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তিনি সত্য-ও-ন্যায়ের দেশ খুঁজে পেলেন না। সব দেশই রয়েছে মানচিত্রে, শুধু ওই সত্য-ও-ন্যায়ের দেশটি কোথাও নেই।

'পেপেল [রুদ্ধস্বরে]: কোথাও পাওয়া গেল না?

'লুকা: লোকটা এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, 'এটা অবশ্যই কোথাও আছে, একটু ভালো করে খুঁজে দেখুন কর্তা, কারণ যদি এই সত্য-ও-ন্যায়ের দেশটা না থাকে, তাহলে আপনার এই গাদা-গাদা বই আর মানচিত্র দিয়ে কী হবে।' কিন্তু ওই শিক্ষিত লোকের কথাটা পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'আমার মানচিত্রগুলো খুব উন্নত, কাজেই আসল ব্যাপার হচ্ছে তোমার সত্য-ও-ন্যায়ের দেশ নামে কোনো জায়গা কোথাও নেই, তাই সেটা মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' এ কথা গরিব লোককে ক্ষিপ্ত করে তুলল। 'এটা কী', ও বলল, 'এতটা বছর আমি এত কিছু সইলাম তার কারণ আমি নিশ্চিত জানতাম ও রকম একটা জায়গা অবশ্যই আছে, আর ওই মানচিত্রগুলো কি না বলছে ও রকম কোনো জায়গাই নেই। আপনার সব মানচিত্র জাল, বুঝলেন, ওটা জাল।' এরপর সে ওই শিক্ষিত লোকটাকে বলল, 'আপনি একটা ইতর। একটা জালিয়াত আপনি, মোটেই শিক্ষিত লোক নন।' তার পরও ওই লোকটাকে কানের ওপর ভীষণ জোরে কয়েকটা থাপড় মারল। এরপর আরেকটা [এক মুহূর্ত থেমে] তারপর বাড়ি ফিরে এসে নিজের গলায় দড়ি দিল' (অনুবাদ: তানভীর মোকাম্মেল)

সুতরাং সংবিধানের বাইরে যাওয়ার আদৌ প্রয়োজন নেই। জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধি এবং তার আগেই বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ দুটিতে নির্দিষ্ট স্থানীয় জনপ্রতিনিধিত্বের সরকার। পাঠক-পাঠিকা, আপনি বলতেই পারেন এটা অসম্ভব ব্যাপার। আপনার কথাটির পিঠে লুইস ক্যারলের লেখা অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড থ্রু দি লুকিং গ্লাস বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে সাদা রানির সঙ্গে অ্যালিসের কথোপকথন থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

'কেবল জায়গাটা বড় নির্জন', অ্যালিস বেশ দুঃখের সঙ্গে বলল। এই নির্জনতার কথা ভেবে তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

'ও হো, ওভাবে কেঁদো না, 'রানিও হতাশ ভঙ্গিতে কেঁদে ফেলল, 'ভাবো তো, তুমি কত সুন্দর মেয়ে। ভাবো তো আজ কতটা রাস্তা হেঁটে এসেছ। ভাবো তো এখন কটা বাজে। যা ইচ্ছে ভাবো কেবল কান্নাটান্না বন্ধ করো।'

অ্যালিস কান্নার মধ্যেও হেসে ফেলল, 'তুমি কি অনেক কিছু ভেবে কান্না থামাও?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ এটাই তো একমাত্র উপায়' রানি বেশ ভেবেচিন্তে জবাব দিল, 'কেউই দুটো কাজ একসঙ্গে করতে পারে না।

এখন তোমার কিছু বিশ্বাস করতে হবে। আমার বয়স ঠিক এক শ এক বছর পাঁচ মাস এক দিন।'
'এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' অ্যালিস বলল।
'পারছ না?' রানির যেন করুণা হলো, 'আবার চেষ্টা করো। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নাও, চোখ বন্ধ করো।'
অ্যালিস হেসে ফেলল, 'চেষ্টা করে লাভ নেই, অসম্ভব জিনিস কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।'
'আমি জোরের সঙ্গে বলছি, তোমার বেশি প্র্যাকটিস নেই।' রানি বলল, 'তোমার মতো বয়সে আমি রোজ আধঘণ্টা করে প্র্যাকটিস করতাম। একেক সময়ে প্রাতরাশের আগেই আমি ছয়টি অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করতে পারতাম।' (অনুবাদ: তাপসী সেন)
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে যেগুলো আছে সেগুলো অসম্ভব কার্যক্রম নয়–এই বিশ্বাস লুইস ক্যারলের রানির মতো প্র্যাকটিস না করলে আমাদের পরিণতি হবে মাক্সিম গোর্কির ওই বুড়ো লোকটির মতো।
বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী: অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট।

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com